বিশ্বায়নের সংহার ও মুক্তির উপায়[১]

ড. আবুল বারকাত

সারসংক্ষেপঃ

বিশ্ববাণিজ্যের নবরূপ ও নতুন নিয়ম-রীতি বিষণ্ন ধরিত্রীর ক্লেশ ঘুচিয়ে দরিদ্র জনগণের মূঢ় ম্লান মূক-মুখে আশা-স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটাবে, বাজার অর্থনীতির কুসুমিত পথ বয়ে সমৃদ্ধির সঞ্জীবনী সুধা বহমান হবে। দেদীপ্যমান দারিদ্র্যের উচ্চকিত হাহাকার দ্রুত হ্রাস পাবে– এমনি ধরনের অনেক আশ্বাস পৃথিবী জুড়ে পল্লবিত ব্যাপক বিশ্বাসের এক বিশাল মহীরূহ সৃজন করেছিল। অর্থনীতিবীদরা প্রচণ্ড প্রত্যয় ও প্রতীতি ধারণ করে বলিষ্ঠ উচ্চারণে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে বাণিজ্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের বর্ধিত প্রবাহ থেকে উল্লম্ফনের শক্তি সঞ্চয় করে দরিদ্র দেশগুলোর গড় আয় ধনী দেশগুলোর পাহাড় প্রমাণ ঊর্ধ্বমুখী আয়ের উচ্চতাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নিরেট বাস্তবের কঠিন মাটিতে হোঁচট খেয়ে সেই আশ্বাস ও বিশ্বাসের প্রতিমা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ বাণীর স্বপ্নমৃগ খেলাঘরের মৃৎপাত্রের মত বিচূর্ণ হয়েছে। তার কারণ এটাই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল বাজার-অর্থনীতির মৌলবাদী ধারণার চোরাবালীর ওপর এবং তার সব মন্ত্রতন্ত্রই নিবেদিত ছিল ধনী দেশগুলোর কল্যাণ তপস্যায়। আমরা যে যুক্তি উপস্থাপন করছি সেটা আমরা বার করেছি অক্সফাম-এর পণ্য বাণিজ্য মেলার (Make Trade Fair) প্রচার ডঙ্কায় উত্তরণের জন্য পরিচালিত গবেষণাকর্মের সংশ্লিষ্ট পাদপীঠ থেকে। আমরা ঋদ্ধ হয়েছি নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিজ-এর সংশ্লিষ্ট যুক্তি-উপাত্তে। বিশেষ করে বিশ্বায়ন ও তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নোবেল ভাষণ আমাদের যুক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশ্ববাণিজ্যের চলতি নিয়ম কোনো ঐশিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা কিংবা মানুষের সাংসিদ্ধিক প্রবণতার প্রতিফলন নয়। এ নিয়মগুলো তৈরী করা হয়েছে ক্ষমতাশালীদের রাজনৈতিক ইচ্ছাদ্বারা। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান বিশ্বের ধনাঢ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কল্যাণই এ বাণিজ্য নীতির লক্ষ্য। কাজেই শেষ পর্যন্ত গণশক্তির বিকাশ ঘটিয়েই পৃথিবীর দরিদ্র দেশ ও গরীব মানুষের কল্যাণ সৃজনের লক্ষ্যে বিশ্ববাণিজ্যের আলোচিত স্থাপত্যকে ঢেলে সাজানো অনিবার্য হয়ে উঠবে।

রূঢ় বাস্তবতাঃ তথাকথিত উন্নয়নের চূড়ান্ত ফলশ্রুতিগুলো কার্যতঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল জাতিপুঞ্জের বিশেষ করে ৪৯টি স্বপ্লোন্নত দেশের মধ্যকার বৈষম্যের প্রসারকে তেজীয়ান করেছে। আলোচ্য বৈষম্যের আংশিক কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পদ ও উপার্জন বিতরণের অসমতা। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সমান অবদান রেখেছে। আলোচ্য বৈষম্য বা অসমতার গুরুতর মাত্রা নিম্নচিত্রিত ছকে বিধৃত হয়েছে।

ছক ৯: উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈষম্য ও অসমতার মাত্রা

সূচক	বিশ্ব গড়	উন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
মাথা প্রতি জিডিপি (পিপিপি ডলার)	৭৫০০	২৮০০০	১২০০
আয়ু (বছর হিসাবে)	৬৭	৭৮	৫২
বয়স্ক শিক্ষার হার	৭০	৯৮	৫৩
পুষ্টি ঘাটতি (জনসংখ্যা %)	১৮	২	৩৭
এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তের হার (১৫-৪৯ বছর বয়স্ক জনসংখ্যর %)	১.২	০.৩৪	৩.৬
যক্ষ্মা রোগী (প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যায়)	৬৪	১৪	৯৬
শিশু মৃত্যুহার	৫৬	৬	৯৮
মোবাইল ফোন (প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায়)	১২১	৫২৭	৩
মাথা প্রতি বিদ্যুৎ ব্যবহার (কিলোওয়াট/ ঘণ্টা)	২০৬৬	৮৪৩১	৬৯

সূত্র: World Development Report, World Bank

[১] ইংরেজি থেকে অনুবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ঈদ সংখ্যা, ২০ নভেম্বর ২০০৩।

রূঢ় বাস্তবতা তো এটাই যে ১৯৯০-এর দশকে উচ্চ আয়সম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ জনসংখ্যার দিক দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও বিশ্বসম্পদের ভাণ্ডারে তাদের বিদ্যমান হিস্‌স্যা সংরক্ষণ করেছে। আলোচ্য দশকের শেষ প্রান্তে এসে দেখা গেছে যে, উচ্চ আয়সম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বের স্থূল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৭৮% শতাংশ অধিকার করেছে। পক্ষান্তরে, বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষের বসতি যেসব দরিদ্র দেশে এবং যাদের জনসংখ্যা নিত্যবর্ধিষ্ণু, সেইসব নিু আয়সম্পন্ন দেশের বিশ্বসম্পদে অংশীদারিত্ব ৩ (তিন) শতাংশে নেমে গেছে। বিষয়টা অন্যভাবে দেখলে চিত্রটি এরকম দাঁড়ায়। আলোচ্য দশকে সমগ্র বিশ্বে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন হয়েছে তার প্রতি ১ (এক) মার্কিন ডলারের মধ্যে ৮০ (আশি) সেন্ট পেয়েছে উচ্চ আয়সম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং চরম দারিদ্র জর্জরিত দেশগুলোর ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ৩ (তিন) সেন্ট। তদুপরি, বিগত শতাব্দির ৯০-এর দশকে উন্নত দেশ ও ন্যূনতম উন্নত দেশ (LDCS) সমূহের মাথা প্রতি জিডিপি হারের ব্যবধান ১ঃ১০ দশমিক এক-এর অবস্থান থেকে ১ঃ২৩ দশমিক ৩-এর অবস্থানে পতিত হয়েছে।

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে সমগ্র বিশ্বের আয়-উপার্জন নিয়ে যেসব বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। রপ্তানী বাণিজ্যের অসম বিতরণ ব্যবস্থা আলোচিত উপার্জন বা আয় বৈষম্যকে প্রসারিত করে চলেছে। আলোচ্য ৯০ দশকে স্বল্প আয়সম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানী বাণিজ্য কার্যক্রমের ফলশ্রুতি থেকে মাথাপ্রতি আয় বেড়েছে মাত্র ৫১ (একান্ন) মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে, একই খাতে ধনী দেশগুলোর আয় অর্জন হয়েছে ১,৯৩৮ (এক হাজার নয়শত আটত্রিশ) মার্কিন ডলার। এমনকি পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তখন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অথচ সে সময় ধনী দেশগুলোর গড় হারের তুলনায় রপ্তানী খাতে পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্জিত প্রবৃদ্ধি হার ছিল প্রায় দ্বিগুণ। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা প্রতি রপ্তানী আয়ের গড় ছিল ১,৪৯৩ (এক হাজার চারশত তিরানব্বই) ডলার। সে তুলনায় পূর্ব এশিয়ায় মাথা প্রতি রপ্তানী আয়ের গড় তৎকালীন ২৩৪ মার্কিন ডলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও একই সময় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী আয় বাড়ছিল দ্বিগুণ হারে। সমকালে আফ্রিকার সাব-সাহারান দেশগুলোর রপ্তানী কার্যক্রম স্থিত ছিল প্রান্তিক অবস্থানে। তার ফলে বিশ্ব উপার্জনে গোটা অঞ্চলের অংশীদারিত্বে দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। সে সময় উক্ত অঞ্চলে মাথা প্রতি রপ্তানী আয় বেড়েছিল মাত্র ৪৬ (ছেচল্লিশ) মার্কিন ডলার। আর তৎকালীন যুক্তরাজ্যের মত খুবই সাধারণ পর্যায়ের শিল্পোন্নত রপ্তানীকারক দেশে মাথাপ্রতি রপ্তানী আয় বেড়েছিল ২৭০১ (দুহাজার সাতশত এক) মার্কিন ডলার।

চিত্র: বিশ্ব রপ্তানী এবং জনসংখ্যার (১৯৯৯) আঞ্চলিক পর্যায়ে অসমতা (১৯৯০ এবং ১৯৯৯)

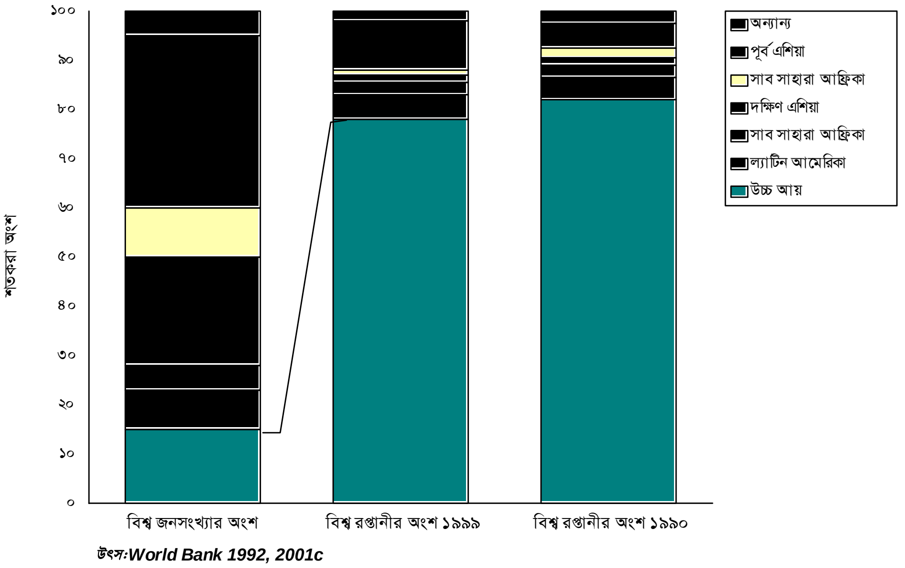

উৎস:*World Bank 1992, 2001c*

বিশ্ব পরিসরে ধনী ও দরিদ্র দেশের বাণিজ্য বৈষম্যের কারণে মানবজাতিকে বিপুল খেসারত দিতে হচ্ছে। আর সে মাশুল গুণতে হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবেই। কারণ আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা যদি বিশ্বের রফতনি বাণিজ্যে তাদের অংশীদারিত্বের আর এক শতাংশ মাত্র ভাগ বাড়াতে পারতো তাহলে পৃথিবীর ১২ দশমিক ৮০ শতাংশ গরীব মানুষ দারিদ্রের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো (অক্সফাম ২০০০)১; দারিদ্র এতটুকু পরিমাণ হ্রাস পেলেই শিশু ও প্রসূতি স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বহুমুখী খাতে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হতো।

বেশিরভাগ ধনাঢ্য রাষ্ট্রকে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়ে প্রতিনিয়ত তাদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা যায়। অথচ সমান্তরালভাবে সেইসব দেশের সরকারই তাদের বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে পৃথিবীর গরীব মানুষের সহায়-সম্বল লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া কার্যকর রেখেছে। গরীব দেশ যখন ধনী দেশে পণ্য রপ্তানী করে তখন তারা উন্নত দেশের তুলনায় চারগুণ অধিকহারে বারার বেড়াজালে আটকে পড়ে। এইসব শুল্ক বেড়া অতিক্রম করতে দরিদ্র দেশগুলোকে ১০০ (একশত) বিলিয়ন ডলার মাশুল গুণতে হয়। গরীব দেশকে ধনী রাষ্ট্রগুলো যে পরিমাণ খয়রাত দেয় রপ্তানী শুল্কের উল্লিখিত পরিমাণ হচ্ছে তার দ্বিগুণ। ধনী দেশের বাজারে গরীব দেশের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নেই। অথচ আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের চাপে গরীব দেশগুলোকে তাদের বাজার উন্মুক্ত রাখতে হচ্ছে সবার জন্যে। এর ফলে গরীব দেশের অর্থনীতি ও জনকল্যাণ কার্যক্রমের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। পণ্যমূল্যের নিুহার এবং অস্থিতিশীলতা গরীব দেশগুলোতে বড় ধরনের সমস্যারূপে বিরাজ করছে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্রের কালো গহ্বরে প্রোথিত হচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিক সমাজ গরীব দেশের এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কোনোদিনও আন্তরিক প্রয়াস চালায়নি। এদিকে শক্তিশালী আন্ত দেশীয় কোম্পানীগুলো (TNCs) দেশে দেশে তাদের বিনিয়োগ ও শ্রমশক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়া অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলেও বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্যার আর এক নাম ও ভিন্ন স্বরূপ হলো বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO); বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ পুঁজি বিনিয়োগ এবং সেবা সংক্রান্ত এমন কিছু বিধি বিধান রয়েছে যেগুলো ধনী দেশ এবং (TNCs) তথা শক্তিশালী আন্তদেশীয় কোম্পানীর স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই কেবল প্রণীত হয়েছে। এসব বিধিবিধান চাপিয়ে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশকে বিপুল মাশুল গুণতে বাধ্য করা হচ্ছে। ধনী দেশ এবং বিশাল কর্পোরেশনগুলোর একান্ত স্বার্থ সংরক্ষণে (WTO) আগ্রহ ও প্রবণতার কারণে এই সংস্থার অর্থনৈতিক এবং নৈতিক বৈধতা নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে ভাবনা

বাণিজ্যের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে আমাদের উদ্বেগের অন্তত তিনটি সঙ্গত কারণ রয়েছে। ১. প্রথমতঃ চলতি বাণিজ্য ব্যবস্থা বিশ্বের গরীব মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে কুখ্যাত আর সে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থা একদিকে শীর্ষ ধনীকে আরও ধনি করছে এবং দরিদ্র মানুষকে হতদরিদ্র করছে। এ দুটো চরম পরিণতি ঘটাবার জন্য দায়ি যে বাণিজ্য ব্যবস্থা তাকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। ২. উদ্বেগের ২য় কারণ এটা যে, বর্তমানে যা ঘটছে সেটা একদিকে যেমন অপ্রতিপাদ্য তেমনি তা টেকসইও নয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের একটা বিরাট অংশ বৈক্লব্যের ছিটমহলে পরিণত হচ্ছে। নৈরাজ্য গ্রাস করছে মানুষের আশা স্বপ্নকে। জীবনযাত্রার মান অবনতির প্রান্তিকে আছড়ে পড়ছে। বাণিজ্য থেকে উৎপন্ন সব সম্পদের সুফল থেকে দরিদ্র জাতিগুলো বঞ্চিত হচ্ছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী নীতিমালার ভিত্তিতে কোনো সমৃদ্ধির অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ৩. তৃতীয় কারণটি আমাদের সেই দৃঢ় বিশ্বাস, যে চলমান পরিস্থিতি কোনো অলজ্ঘনীয় অচলায়তন নয়। এটি একটি অপসারণযোগ্য জগদ্দলপাথর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়তির বিধান নয়, মানুষের তৈরী বিনিময় ব্যবস্থা। একে নিয়ন্ত্রণ করছে বৃহৎ শক্তির রাজনৈতিক ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট বিধি-বিধান ও প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও সম্পদের বৈষম্য বাড়াচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা তার অপনোদন সম্ভব কেবল মানবিক ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য এবং জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটিয়ে।

বিশ্বায়নের পক্ষে-বিপক্ষে দুটি বিপরীতমুখী মতবাদ নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে। একদল বলছেন বিশ্বায়ন দারিদ্র লাঘব করছে। অন্যপক্ষ মনে করে বিশ্বায়নের অবধারিত পরিণতিতে বিশ্বময় দারিদ্র ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। এ তরফের ধারণা হচ্ছে বাণিজ্যের পরিমাণগত স্বল্পতাই গরীব দেশের জন্য মঙ্গলজনক। তারা ক্ষতিকর শর্তে বাণিজ্য করার চাইতে বাণিজ্য বর্জনকেই শ্রেয় মনে করছেন। চলতি সময় বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনায় উঠে এসেছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিতে বিশ্বায়নের ব্যর্থতার বিষয়টা যুক্ত হয়েছে। তবে পক্ষে-বিপক্ষে বাকযুদ্ধের কারণে কোনো আলোচনা বৈঠকই সফল হতে পারছে না। কেননা কোনো পক্ষই আলোকিত ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে পারছে না। এ পর্যায়ে আমরা একটি বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে আনতে পারি। এখন সারা বিশ্বের স্থূল দেশজ উৎপাদনের চাইতে অনেক বেশি দ্রুতহারে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের আর্থিক অর্জনে বাণিজ্যই এখন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তার ফলে বাণিজ্যের ধরন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে আয় বন এবং দারিদ্র লাঘবের প্রক্রিয়াতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। উন্নয়নশীল দেশগুলোও জিডিপির চাইতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অর্জনে অধিকতর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। রপ্তানী বাণিজ্য তাদের যৌথ জিডিপির এক চতুর্থাংশের সমান হয়েছে। ধনী দেশের চাইতে উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানী প্রবৃদ্ধির আলোচ্য হার পরিমাণগতভাবে বেশি।

প্রনিধাণযোগ্য আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এটা যে উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য সত্তার বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতিতে পরিবর্তনের বাতাস লেগেছে। অনেকেই এখনও প্রাথমিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও তৈরী পণ্যের অংশ ক্রমেই বাড়ছে। বিগত দশকে উন্নততর প্রযুক্তি সহযোগে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানীতে দখিনা বাতাসের ঝাপ্টা লেগেছিল। সে সময় চীন ভারত এবং মেক্সিকোর মত দেশগুলো একাধারে শীর্ষ প্রযুক্তি ও মানবশক্তি সমন্বিত পণ্যের প্রধান যোগানদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আন্তঃদেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কল্যাণে বিশ্ব বাণিজ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তাতে করে বিশ্বময় উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক সুবিধাগুলো সংযুক্ত হয়েছে। আন্তঃদেশীয় সংস্থাগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক বাণিজ্য বিশ্ববাণিজ্য প্রসারে ব্যাপক শক্তি যুগিয়েছে। 'সর্ববৃহৎ ১০০ (একশত)টি (TNC)-এর বৈদেশিক বিক্রয়' বিশ্ববাণিজ্যের এক চতুর্থাংশের সমান এবং আন্তঃকোম্পানী ব্যবসার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমান। উৎপাদন, পুঁজি বিনিয়োগ এবং পণ্য বাজারজাতকরণের নিজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে (TNC) তথা আন্তঃজাতীয় কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনকারী এবং ধনী দেশের ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তবে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিক, চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের শ্রমিক এবং মধ্য আমেরিকার মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলের শ্রমিক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কৃষি খামারের শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরদের সকলের জন্যই বিশ্বায়ন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে– অন্যদিকে আনুকূল্য ও সহায়তা সে তুলনায় খুবই ম্লান হয়ে পড়েছে।

সম্পদ বৈষম্য ও দারিদ্র বিমোচনে বাণিজ্যের ভূমিকাঃ

বিপুল হারে বৈদেশিক সাহায্য আত্নসাৎ একটি সন্দেহাতীত বাস্তবতা। তুলনামূলক বিচারে সাহায্যের চাইতে বাণিজ্যই দরিদ্র মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যে তাদের শরিকানা যদি কেবল মাত্র পাঁচ শতাংশ বাড়াতে পারে তাহলেই তাদের উপার্জন বেড়ে যাবে ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর এই বর্ধিত আয়ের পরিমাণ হবে সাহায্যের চাইতে সাতগুণ বেশি। আফ্রিকা যদি বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যে তাদের অংশীদারিত্ব আর মাত্র এক শতাংশ বাড়াতে পারে তাহলে উক্ত অঞ্চলের আয় ৭০ (সত্তর) বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে যাবে। আর এই আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হবে সাহায্য এবং ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের চাইতে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। টেকসই রপ্তানী প্রবৃদ্ধি দারিদ্র বিমোচনে খয়রাতি সাহায্যের চাইতে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অক্সফাম-এর গবেষকদের (২০০২) দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যে প্রত্যেক উন্নয়নশীল অঞ্চলের অংশীদারিত্ব ১ (এক) ভাগ মাত্র বৃদ্ধি করা গেলে বিশ্বের দারিদ্র ১২ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাদের গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে, স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মানুষ বাস করছে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ তিন শতাংশের কম। এটা কেবল পরিসংখ্যান নয়, প্রকৃতপক্ষেই

উন্নয়নশীল দেশের জনজীবন বিশ্ব বাণিজ্যের চলতি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই ক্রমাগত দারিদ্রকৃত হচ্ছে। অথচ ধনী দেশে রপ্তানী বাণিজ্য এবং সেবা খাতে মাথাপ্রতি ৬,০০০ (ছয় হাজার) মার্কিন ডলার আয় উৎপন্ন হচ্ছে। পাশাপাশি অভিন্ন খাতে উন্নয়নশীল দেশের মাথাপ্রতি অর্জন মাত্র ৩৩০ (তিনশত তিরিশ) মার্কিন ডলার এবং নিম্ন আয়ের গরীব দেশে এসব খাত থেকে মাথাপ্রতি আয় আসছে মাত্র ১০০ (একশত) ডলার। এই পরিসংখ্যানে জনসংখ্যাভিত্তিক বাণিজ্য শরিকানার বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে।

পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে রপ্তানী বাণিজ্যে দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে ৪০০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্রসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভিয়েতনাম এবং উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদনের কল্যাণে পল্লী দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। শ্রমঘনিষ্ঠ উৎপাদন, যেমনটি বাংলাদেশে ঘটছে, নারী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনছে। সাফল্যের এই ইতিবৃত্তের মাঝে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্ধিষ্ণু বৈষম্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দারিদ্র বিমোচনের গতিকে মন্থর করে তুলেছে এবং রফতানী প্রবৃদ্ধির সঙ্গী হয়েছে চরম মাত্রার শোষণ পদ্ধতি। মহিলা শ্রমিকরাই অধিকহারে সে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। তবে এটা কোনো অনিবার্য পরিণতি নয়। এ পরিস্থিতির জন্য দায়ি করা চলে গরীবের স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় তাদের নতজানু নীতিকে।

বাণিজ্য গরীব মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তবে সুবিধাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে না। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, রপ্তানী খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসের হার দ্রুততর করার নিশ্চয়তা দেবে না। তবুও বাণিজ্য সম্ভাবনা যখন ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় তখন সেটা মানবোন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শক্তিশালী প্রণোদনা যোগাতে পারে। আর উচ্চমূল্য সংযোজিত পণ্যের বাণিজ্যে সম্পৃক্ত থেকে ন্যায়সঙ্গত বিতরণ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হলে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি জীবন যাত্রার দ্রুত মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

আমরা সমাজচ্যুত

অনড় দারিদ্র এবং ক্রমবর্ধমান অসমতা বিশ্বায়নের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। বাণিজ্য কৌশল খাটিয়ে ধনী দেশগুলো বিপুল মুনাফা লুটে নিচ্ছে, তাদের সম্পদের পাহাড় আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে। অন্যদিকে ১শ ১০ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন মাথাপ্রতি মাত্র এক মার্কিন ডলার সমান আয় নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে দেশে দেশে। ধনী দেশগুলোতে বসবাস করছে পৃথিবীর মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ, অথচ বিশ্ব জিডিপির ৭৮ শতাংশই তারা ভোগদখল করছে।

বাণিজ্য বৈষম্য এই অসমতাকে আরও প্রসারিত করছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত প্রতি এক ডলার আয়ের মাত্র তিন সেন্ট পাচ্ছে স্বল্প আয়ের দেশসমূহ। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানীর পরিমাণ অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিপুল প্রারম্ভিক বৈষম্যের সামগ্রিক ব্যবধান বেড়েই চলেছে। ১৯৯০-এর দশকে রপ্তানী খাতে দেশগুলোর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপ্রতি ১৯৩৮ মার্কিন ডলার, নিম্নবিত্তদের আয় বেড়েছে মাথাপ্রতি ৫১ মার্কিন ডলার; মধ্যম আয়ের দেশে মাথাপ্রতি আয় বৃদ্ধি ঘটেছে ৯৮ মার্কিন ডলার।

বাইরের থেকে যেসব দেশকে মনে হচ্ছে রমরমা বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা ধনী দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তারাও প্রকৃতপক্ষে স্বল্পমূল্য সংযোজনের গ্যাড়াকলে আটকে আছে। এসব ক্ষেত্রে বাণিজ্য সমৃদ্ধি তাদের দেশে বিরাজমান দারিদ্রের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। মেক্সিকোর কথাই ধরা যাক। তারাই সবচাইতে বেশি পরিমাণে উচ্চ প্রযুক্তিজাত পণ্য ও সেবা উপকরণ চালান দিচ্ছে। কিন্তু তাদের মোট রপ্তানী মূল্যের মাত্র দু'ভাগ যোগান আসছে দেশজ উপকরণ থেকে। বাংলাদেশ ও হন্ডুরাসের মত দেশগুলো বিপুল পরিমাণ তৈরী পোশাক রপ্তানী করছে। কিন্তু তাদের রপ্তানীকৃত পণ্যে উৎপাদন উপকরণের ৯৮ ভাগই আসছে বিদেশ থেকে। এ দু'টি দেশই টিএনসির সহায়তায় বিদেশ থেকে কাপড় এবং অন্যান্য উপকরণ এনে কেবল দর্জির কাজ করে নিজের দেশের লেবেল এঁটে আবার তা বিদেশে রপ্তানী করছে। এতে প্রযুক্তিগত কোনো বিনিময় ঘটছে না।

বিশ্ববাজারে প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানী সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকার সাব-সাহারান দেশগুলো তাদের প্রাথমিক পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল পরিমাণ লোকসানের বোঝা বইতে শুরু করেছে। তার ফলে প্রাপ্ত প্রতি এক ডলার খয়রাতি সাহায্যের অর্ধেকই (৫০ সেন্ট) তাদেরকে খেসারত দিতে হয়েছে সেই লোকসান পোষাতে। (সূত্রঃ অক্সফাম গবেষণা, ২০০২) বাণিজ্য তত্ত্ব থেকে আমরা শিখছি যে পণ্য রপ্তানী সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা যোগাবে। সমগ্রতা প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে না। ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তাকালেই তার পরিষ্কার চিত্র দেখা যাবে। সেখানে রপ্তানী খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু সেই সাথে বেকারত্বও বেড়েছে সাঁই সাঁই করে। উপার্জন স্থবির হয়েছে। ন্যিতম মজুরির প্রকৃত পরিমাণ অনেক কমে গেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পল্লীবাসী গরীব মানুষ। কাজেই বাইরের চাকচিক্য দেখে কোনো দেশের বাণিজ্য সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করা যাবে না। অনেক দেশেই বাণিজ্যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের শ্রমিকরা দারুণভাবে শোষিত হচ্ছে। উদয়াস্ত গতর খাটিয়েও পেটপূর্তি মজুরি পাচ্ছে না। তাদেরকে জবরদস্তি ওভারটাইম খাটানো হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলীয় বিধিনিষেধ

উত্তরাঞ্চলীয় সরকারগুলোই গরীব দেশের ওপর সবচাইতে বেশি বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ ও রপ্তানী কড়াকড়ি আরোপ করছে। গরীবের শ্রমে গড়া কৃষিপণ্য এবং তৈরী পোশাক ধস্তাধস্তি করে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু তাদেরকে ধনী দেশের তুলনায় চারগুণ বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। ধনী দেশের বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খেসারত দিতে হচ্ছে। আর এই আক্কেলসেলামীর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রাপ্ত খয়রাতি সাহায্যের দ্বিগুণ। বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চল সাব-সাহারান আফ্রিকা। তারা হারাচ্ছে বছরে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারত এবং চীন যে মাশুল গুনছে তার পরিমাণ ৩ বিলিয়নের বেশি। এগুলো তো কেবল প্রত্যক্ষ খেসারত। বিনিয়োগ মওকা এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতার ওপর সুদূর প্রসারী লোকসানের চাপ পড়বে খুবই ভারি।

ধনী দেশের বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ বিশেষভাবে গরীব মানুষের কোমর ভেঙে দিচ্ছে। কারণ এসব বিধি-নিষেধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে শ্রমঘন কৃষিপণ্য ও শিল্প উৎপাদনের ওপর। অক্সফাম গবেষকরা ধনী শিল্প মালিকদের ভণ্ডামির যে সূচক উদ্ভাবন করেছেন তাতে দেখা যায় যে শিল্পায়িত কোনো দেশই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য নয়, দুর্বৃত্তপনায় উদীয়মান ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথায়ও বাড়ি দিতে ছাড়েনি। শিল্পায়িত দেশের সরকারগুলো কৃষি খাতেই সবচাইতে বেশি কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করছে। ধনী দেশগুলো স্বদেশে প্রতিদিন এক বিলিয়ন (একশত কোটি) ডলারের অধিক ভর্তুকি যোগান দিয়ে চলেছে। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নিজেদের কৃষি বাণিজ্যে আগামী দশবছরে ৩০০ বিলিয়ন (৩০ হাজার কোটি) ডলার ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে (স্টিগলিজ, ঢাকা, ১৪-০৮-০৩); এই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকির ফায়দা লুটবে কৃষিখাতের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যবসায়ীরা। তারা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে। বাড়তি উৎপাদন দিয়ে বাজার সয়লাব করে দেবে। উদ্বৃত্ত পণ্য বিশ্ববাজারে নিয়ে স্তূপ করবে। সেজন্যও তারা করদাতা এবং ভোক্তাদের ঘাড় ভেঙে আরও বেশি হারে ভর্তুকি আদায় করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অপকৌশল ধরা পড়ছে বিশ্ববাজারে স্তূপীকৃত তাদের রপ্তানী পণ্যের বিপুল মজুদ থেকে। এই দু'কৃষি পরাশক্তি উৎপাদন ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের অধিক ঘাটতি মূল্যে বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য রপ্তানী করছে। ধনী দেশের এই বাণিজ্যিক অপকৌশলের কাছে মার খাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। তারা মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিপুল লোকসান গুনছে। মুখ থুবড়ে পড়ছে দারিদ্র্যের ডোবাজলে নিমজ্জমান গরীব দেশের কৃষি বণিকরা। হাইতি, মেক্সিকো এবং জামাইকায় রপ্তানীকৃত ধনী দেশের সস্তা মূল্যের খাদ্য সেসব দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ধ্বংস করছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর দরিদ্রতম কৃষকরা ধনিক শ্রেণীর বিপুল অর্থবিত্তের সাথে মারাত্মক রকমের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং জাপান ক্রমাগত লঙ্ঘন করে চলেছে গরীব দেশের জন্য বাজার সুবিধা দেয়ার অঙ্গীকার। স্বদেশে কৃষিখাতে ভর্তুকি কমাবার পরিবর্তে তারা সেটা আরও বৃদ্ধি করেছে। বস্ত্র এবং তৈরী পোশাক আমদানি নিয়ন্ত্রণকারী মালটি ফাইবার ব্যবস্থার স্তর বিন্যাসের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তারা এক-চতুর্থাংশের কম পণ্যের ক্ষেত্রে

আংশিক উদার নীতি নিয়েছে যেখানে তাদের বাজার মুক্ত করে দেয়ার কথা ছিল। এ আচরণও WTO তথা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের নীতিমালা অর্থাৎ 'বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি কর, বাণিজ্যের গতিপথ পরিবর্তন করো না'–এই নীতির পরিপন্থী। (সূত্রঃ স্টিগলিজ, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০০৩) তবে একথা সত্য যে, ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দারিদ্র লাঘবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। বাজার প্রসারিত করে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় প্রবল অনুপ্রেরণা যোগানোটাও সম্ভব। দরিদ্র শ্রেণীর জন্য সুযোগ প্রসারের অভ্যন্তরীণ কৌশল এ ব্যাপারে অধিকতর সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এসব উজ্জীবনী প্রয়াস ও উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে নিম্নোক্ত কর্মপন্থাগুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজনঃ ১. উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের কৃষি ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান; ২. সর্বনিম্ন আয়ের দেশের পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করা; ৩. উন্নয়নশীল বিশ্বের শ্রমঘন প্রধান পণ্য বস্ত্র ও তৈরী পোশাকের জন্য বাজার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে মালটি ফাইবার ব্যবস্থার স্তর বিন্যাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা; ৪. কেবল উৎপাদন না বাড়িয়ে সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রপ্তানী ভর্তুকির ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ। উল্লেখ্য যে, বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি করার বিষয়টি হচ্ছে বাণিজ্য এবং দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বলিষ্ঠকরণের অন্যতম শর্ত। তবে এটাও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা যে, পৃথিবীতে এমন অনেক গরীব দেশ রয়েছে যারা অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণে বাজার সুবিধা প্রসারিত করলেও তার সুযোগ নিতে সক্ষম হবে না। ভূমির অভাব, ঋণ প্রাপ্তির সঙ্কট, স্বাস্থ্য সেবা এবং অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব তাদের এই দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ।

বাণিজ্য উদারিকরণ ও দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ কি হতে পারে?

বাণিজ্য বিধি-নিষেধ শিথিলকরণ দারিদ্র বিমোচনের প্রাঞ্জল কর্মকৌশলের অংশ বিধায় উন্নয়নশীল দেশে সুবিন্যস্ত এবং সুষ্ঠু পরম্পরাযুক্ত আমদানী উদারিকরণ নীতিও গরীব মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তবে দ্রুত আমদানী উদারিকরণ উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ক্ষেত্রেই দারিদ্র এবং সম্পদ বৈষম্য আরও ঘনীভূত করেছে। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্ত ঋণ শর্তাবলী আলোচ্য সমস্যায় একটি প্রধান অংশ জুড়ে বিরাজ করছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং উত্তরাঞ্চলীয় সরকারগুলো বাণিজ্য উদারিকরণের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের এই ওকালতির পিছনে বাধ্যতামূলক কিছু ঋণশর্ত বাধা রয়েছে যেগুলো দ্রুত বাণিজ্য বিধি-নিষেধ হ্রাসের দাবি রাখে। দরিদ্র দেশগুলো সেকারণেই ধনী দেশের তুলনায় অনেক বেশি তড়িঘড়ি এবং এলোপাতাড়িভাবে তাদের অর্থনীতির বন্ধ দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা দেশগুলোতে আমদানি শুল্ক গড়ে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় উক্ত শুল্ক হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক যুক্তি দেখাচ্ছে যে, বাণিজ্য উদারিকরণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আনুকূল্য সৃষ্টি করবে এবং গরীব মানুষ সে প্রবৃদ্ধির ন্যায়সঙ্গত অংশীদার হবে। তথাকথিত নিষ্যন্দনের (চুঁইয়ে পড়া) সপক্ষে বিশ্বব্যাংকের এই যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর। এই চুয়ানো দর্শনভিত্তিক পরবর্তী সব পরামর্শ একই কারণে ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। খোলামেলা নীতির ব্যাখ্যা নিয়ে যে সংশয় সৃষ্টি হয়, সমস্যার উৎস সেটাই। বিশ্বব্যাংক বাণিজ্য ও জিডিপির মধ্যে হারাহারিজনিত অর্থনৈতিক ফলশ্রুতিকে উদারিকরণের অনুকূলে নীতি পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব বলে বিবেচনা করে থাকে। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি যে, তড়িঘড়ি আমদানী উদার না করেই চীন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম-এর মত অনেক দেশ খুবই সফলভাবে বিশ্ববাজারের সাথে নিবিড় সংহতি স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যদিকে অনেক দেশ আছে যারা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন হুবহু অনুসরণ করছে। দারুণ উৎসাহ নিয়ে তারা আমদানী নীতির ওপর থেকে সব বিধিনিষেধ দ্রুত অপসারণ করছে। এতদসত্ত্বেও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তারা তেমন কোনো সুফল অর্জন করতে পারছে না। অনেক গবেষণা থেকেই এ কথা জানা গেছে যে, বহু দেশে দ্রুত বাণিজ্য উদারীকরণ সম্পদের বৈষম্যকে উচ্চকিত করে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছে। পেরুর উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, সেখানে উঁচু জমির ওপর গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র খামারগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত খামারের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় চলছে। মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র রাজ্যগুলো উত্তরাঞ্চলের তুলনায় আরো গরীব হয়ে পড়ছে। ভারতে

বাণিজ্য উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে পল্লী অঞ্চলে সম্পদ বৈষম্য বাড়ছে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিত্ত ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজনঃ ১. আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ঋণের সাথে বাণিজ্য উদারীকরণের বাড়তি শর্ত জুড়ে দেয়া উচিত হবে না। ২. বিশ্বব্যাংকের শর্ত পূরণ করতে চেয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে। তার সাথে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নত দেশের আমদানি বাণিজ্যের বিধিনিষেধ সমপরিমাণে হ্রাস করা বাঞ্ছনীয় হবে।

প্রাথমিক পণ্যের চাহিদার কমতি কেন?

পৃথিবীর হতদরিদ্র দেশগুলোর অনেকেরই অর্থনীতি প্রাথমিক পণ্যের ওপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। পঞ্চাশটির অধিক উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি আয়ের অর্ধেকের বেশি আসে মাত্র তিনটি অথবা তারও চেয়ে কম সংখ্যক প্রাথমিক পণ্য থেকে। এসব দেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের পারিবারিক অর্থনীতি মন্দা বাজারের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের একটি হচ্ছে কফি। ১৯৯৭ সন থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে কফির মূল্য ৭০% কমে গেছে। তার ফলে গরীব দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ৮ বিলিয়ন (৮০০ কোটি) ডলার ঘাটতি হয়েছে। এই লোকসানের পরিমাণ অনেক দেশের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের চাইতে বেশি। এতে গরীব মানুষের জীবনের দুর্দশা বেড়েছে। তানজানিয়া, দক্ষিণ মেক্সিকো এবং হাইতিতে পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা গেছে সেখানকার গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জন্য চিকিৎসা ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের মেয়েদেরকে খামারের বাইরে বাড়তি শ্রম দিতে হচ্ছে এবং পুরুষরা কাজের সন্ধানে দেশান্তরি হচ্ছে (অক্সফাম ২০০০)। অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু বাজারে চাহিদার চেয়ে বেশি পণ্য সরবরাহ এই মন্দার জন্য দায়ী। ব্যাপক ক্ষেত্রে চাহিদা অনুপাতে মাত্রাতিরিক্ত সরবরাহের কারণে বাজারে পণ্য মজুদ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। তার ফলে পণ্য মূল্যে মৌসুমী ধস নেমেছে। এ ধরনের ব্যাপক মন্দা ও বাণিজ্য বিপর্যয় পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পরিবার এবং ব্যক্তি মানুষকে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। লাভের কড়ি গুনেছে সেইসব ধনকুবের টিএনসি, যারা বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের মধ্যে Nestly Corportion Nike ও Uniliver-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে কল্যাণমুখী অবস্থানে নিতে হলে পণ্য বাজারের উল্লিখিত সঙ্কট মোচন হওয়া খুবই প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১. বিশ্ব বাজারের দেখভালের জন্য নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং পণ্য চুক্তিতেও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মন্দা বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য এসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যুক্তিপূর্ণ মাত্রায় চাহিদার সাথে সরবরাহের সমন্বয় ঘটাতে নয়া অর্থায়ন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন নতুন সংস্থার লক্ষ্য হতে হবে। নতুন কৌশল নির্ধারণ করে গরীব দেশের পণ্যে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যেও নতুন ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তুলতে হবে।

২. টিএনসিগুলোকে সামাজিক দায়িত্বশীল ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক পণ্য ক্রয়ের পরিধি বাড়ানো এবং রপ্তানিকারক দেশের জনজীবনে একটি যুক্তিসঙ্গত মান স্থিতিশীল রাখতে বিশ্ব বাজারে ঘোর মন্দার সময় ন্যায্য মূল্য সংযোজনের বিধান প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

এফডিআই-এর গলদ কোথায়?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি অংশ হচ্ছে এফডিআই (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) বা সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ; এর অনেকগুলো সম্ভাবনা ও সুবিধার দিক রয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক সম্পদ, প্রযুক্তিগত সহায় ও বাজার সুবিধার প্রসার ঘটাতে এই ব্যবস্থা অবদান রাখতে পারে। তবে আলোচ্য ব্যবস্থাধীনে চলতি ফায়দাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। লভ্যাংশ প্রত্যাবাসনের উচ্চহার, পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে উচ্চমূল্যের ইনসেনটিভ দেয়ার ব্যবস্থা, কর পরিহার প্রভৃতি বিনিয়োগের প্রকৃত ফায়দা থেকে সংশ্লিষ্ট দেশকে

বঞ্চিত করছে। প্রতি এক ডলার বিনিয়োগ থেকে ৩০ সেন্ট লভ্যাংশ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারী দেশে ফিরে যাচ্ছে। (সূত্রঃ অক্সফাম ২০০০)। এ কথা সত্য নয় যে, 'সব বিনিয়োগই উত্তম বিনিয়োগ।' উন্নয়ন সংজ্ঞায় সেটাই ভাল বিনিয়োগ যার মাধ্যমে শ্রমদক্ষতা এবং প্রযুক্তি বদল হয় এবং স্থানীয় অর্থনীতির সাথে গতিশীল সংযোগ স্থাপন করে। অনেক ক্ষেত্রেই FDI এসব শর্ত পূরণে খাপেখাপ হচ্ছে না। ল্যাটিন আমেরিকায় FDI গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়ক হয়নি বরং প্রযুক্তি নির্ভরতাকে বাড়িয়ে এনেছে। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলোতেই সবচেয়ে নিম্নমানের FDI এসে ঢুকছে। বাংলাদেশ এবং মেক্সিকোতে যেমনটি ঘটছে তেমনি অনেক দেশেই মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলো দেশীয় অর্থনীতির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটমহলের অবস্থানে চলে যাচ্ছে। খনিজ সম্পদ আহরণে নিয়োজিত FDI-এর রেকর্ড সবচাইতে খারাপ। দ্বন্দ্ব-বিসম্বাদ তীব্রতর করায়, পরিবেশের চরম ক্ষতি সাধন করায় এবং স্থানীয় বসতি উচ্ছেদে ভূমিকা রাখায় FDI অকল্যাণকর বিবেচিত হয়েছে। (নাইজেরিয়ার তেল উত্তোলন ক্ষেত্র, ভারতের ইউনিয়ন কারবাইড এবং বাংলাদেশের মাগুরছড়া এ ব্যাপারে বিশেষ নজির হয়ে রয়েছে)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিধির গলদ কোথায়?

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার সংক্রান্ত আইনের (TRIPs) বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধিমালাই WTO চুক্তিভুক্ত খারাপ বাণিজ্যবিধির সর্বপ্রধান নজির। জগদীশ ভগবতি এবং জোসেফ স্টিগলিজ এর মত আরো অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, TRIP সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো WTO চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ আলোচ্য বিধিমালা বিশ্বের হতদরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি সাধন করছে এবং জৈবনিক সঞ্চয়ের ওপর আঘাত হানছে। ট্রিপ (TRIPs)-এর আওতায় পেটেন্ট সংরক্ষণের লক্ষ্যে আরো বেশি আইনগত কড়াকড়ি আরোপিত হলে তাতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের খরচ বেড়ে যাবে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর লাইসেন্স খরচ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই লাইসেন্স মাশুল আদায় করছে উত্তরাঞ্চল ভিত্তিক TNC গুলো। যার অর্ধেকটাই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার সংক্রান্ত জটিল যুক্তির পশ্চাতে রয়েছে TRIPs চুক্তির অধীনে বৈধতাপ্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভাঁওতাবাজি। সেগুলোকে WTO -এর বিধিমালা দিয়ে অনুমোদন করা হয়েছে। (সূত্রঃ অক্সফাম ২০০২) ওষুধ শিল্পকে TRIP-এর আওতায় আনা হলে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে। উন্নয়নশীল দেশের নজীর থেকে দেখা যাচ্ছে, পেটেন্ট অধিকার সংরক্ষণের বাড়তি প্রয়াস জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধের মূল্য দ্বিগুণ হারে বাড়িয়ে দেবে এবং তার ফলে চিকিৎসা খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এর মধ্যেই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে গরীব মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ওষুধের পিছনে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ওষুধের ওপর পেটেন্ট আগ্রাসনের অনিবার্য পরিণতিতে অকাল মৃত্যু, অকারণ অসুস্থতা, আবেগতাড়িত উদ্বেগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজনন অক্ষমতাও বাড়বে। গরীবের সর্বনাশ হবে। চিকিৎসা খরচ বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। দু'হাতে ফায়দা লুটবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ। কৃষি খাতেও ধনী দেশের বহুজাতিক আগ্রাসনের পাঁয়তারা চলছে। যৌথ বিনিয়োগকারীদের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় সরকারগুলো বীজ দস্যুতা জায়েজ করে দিয়েছে। তারা উন্নয়নশীল দেশ থেকে জেনেটিক উপাদান হরণ করে সেগুলো পেটেন্ট করে ফেলছে। এসব উপকরণের ওপর দুই শতাংশ হারে রয়ালটি ধার্য হলে ৫ বিলিয়ন ডলার আয়, উৎপন্ন হবে। ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি খামারের জন্য এটা হবে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। তারা হয়ত বীজ সংরক্ষণ, বিক্রি এবং বিনিময়ের অধিকার হারাবে।

গ্যাট চুক্তির আওতায় শিল্প সমৃদ্ধ ধনী রাষ্ট্রগুলো TNC বিনিয়োগকারীদের জন্য অর্থনৈতিক সেবা, বেসিক ইউটিলিটি এবং মজুর সরবরাহের নতুন বাজার উদ্বোধন করছে। ইতোমধ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতি গরীব দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরি পণ্য চাহিদা পূরণের দোহাই দিয়ে গ্যাট চুক্তির অধীনে বিজাতীয়করণের এমন সব পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে যাতে উন্নয়নশীল জাতিগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংশোধিত হওয়া দরকার ঃ

১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO-র বুদ্ধিবৃত্তির ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরাজমান নীলনকশার বৈশ্বিক প্রয়োগের অবসান ঘটাতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নমনশীল সংস্থান সংরক্ষণের অধিকার দিতে হবে।

২. মন্ত্রী পর্যায়ের দোহা সম্মেলন ২০০১-এর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পেটেন্ট মালিকানা নির্ধারণের বেলায় জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. খাদ্য ও কৃষির জন্য জেনেটিক সম্পদের পেটেন্ট সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করতে হবে। গরীব দেশগুলোকে তাদের যুৎসই ফল-ফসলের বৈচিত্র্য ঘটাবার জন্য আরো মজবুত অধিকার দিতে হবে। সেই সাথে কৃষকের বীজ সঞ্চয় বিক্রি এবং বিনিময়ের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. গরীব দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে অগ্রাধিকার ভুক্ত করার জন্য সেবা চুক্তিসমূহের পুনঃসম্মিতি ঘটাতে হবে। উদারিকরণ তালিকা থেকে জনস্বার্থের অপরিহার্য সেবা খাতগুলোকে বাদ দিতে হবে। জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বলীয়ান করার লক্ষ্যকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫. উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষ এবং পার্থক্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত WTO বিধিবিধানগুলোকে আরও মজবুত করতে হবে। গরীব দেশের সরকারগুলো বৈদেশিক সাহায্য নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার ও তাদের শিশু শিল্পের সার্থরক্ষার অধিকার দেয়ার লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত বিধি-নিষেধসমূহ উঠিয়ে নিতে হবে।

   আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুফলের বিভব ঘটাতে হলে ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলোকে যুগপৎভাবে গরীবের অনুকূলে সুবিধা পুনর্বণ্টন করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নতুন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে নতুন বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাপনাও প্রবর্তন করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্য নীতিকে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার গণ্ডি অতিক্রমের যোগ্য করতে হবে। গরীব দেশে বিরাজমান স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা প্রসার ব্যবস্থার অসমতা এবং সম্পদের মালিকানা বৈষম্য গরীবের অনুকূলে কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। জমির অভাব, বাজার অবকাঠামোর অভাব এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠি বাজার সুবিধার আনুকূল্য নিতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি আমদানীকৃত পণ্যের বিপরীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অনেক দেশে সীমাহীন দুর্নীতি এবং আমলাতন্ত্রের অসীম পরাক্রম বাণিজ্যের ওপর সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে আছে। সে কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বিপুল পরিমাণ মাশুল গুনতে হচ্ছে। গণমুখী প্রাতিষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মৌল যুক্তি ও তাৎপর্য এসবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বিশ্ববাসীকে দারিদ্র অক্টোপাসের বেষ্টনমুক্ত করতে হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বহুমুখী ব্যবস্থাকে আরও বলীয়ান করতে হবে। অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে বিশ্ববাজারের সাথে সংহতি স্থাপন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির অনুকূলে সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহকে উন্নয়ন সহযোগিতা পেতে হবে। কিন্তু ধনী দেশগুলো ১৯৯২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত উক্ত সহায়তা খাতের বাজেট বরাদ্দ ১৩ বিলিয়ন ডলার কাটছাঁট করায় বিপত্তি ঘটেছে। সাহায্য কর্তনের ফলে দুর্যোগ নেমে এসেছে বেশ কয়েকটি হতদরিদ্র দেশের কৃষিখাতে। অথচ এসব ক্ষেত্রে সমন্বিত সহযোগিতার ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে দারিদ্রের চাপ কমিয়ে আনা সম্ভব ছিল। নিু আয়ের দেশগুলো বহুকাল ধরে ঋণখেলাপী হয়ে দেনা-দায়গ্রস্ত হয়ে রয়েছে। তাদের সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। বেসরকারি পুঁজি বাজারে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তারও কোনো কার্যকর সমাধান কেউ দিতে পারছে না। তার ফলে আরও নতুন জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় অসহনীয়ভাবে ঋণগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলো দায়মুক্ত হওয়ার জন্য হয়ত ধনী দেশে রপ্তানিকৃত পণ্যের মাধ্যমে ঋণদাতা মহাজনের হাতে তাদের জাতীয় সম্পদ তুলে দিতে বাধ্য হবে।

চলমান সময়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তথা WTO-এর ছত্রচ্ছায়ায় বিশ্ববাণিজ্য পরিচালন ব্যবস্থা বৃহৎ পুঁজি বা সম্পদের একনায়কত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিচালন ব্যবস্থার ওপর ধনী দেশগুলো অসম

অনুপাতে প্রভাব খাটিয়ে চলেছে। তারা সম্পদ বণ্টনের জন্য কৃত্রিম স্থাপত্য রচনা করেছে। ধনকুবেররা ক্ষমতার অনানুষ্ঠানিক আঁতাতের মাধ্যমে WTO-এর আলোচনার টেবিলে দরদস্তুরের ক্ষেত্রে নিজেদের পাল্লা ভারি করে রেখেছে। ইতোমধ্যে শক্তিধর TNC গুলো WTO-এর আওতার বাইরে অবস্থান নিয়ে বাণিজ্য নীতি পরিচালনায় অসম অনুপাতে প্রভাব খাটাতে শুরু করেছে। সকল ক্ষেত্রে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর করে তোলার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার বিধি-বিধানসমূহের সংস্কার করা দরকার।

পূর্বোল্লিখিত সংস্কার সুপারিশের সাথে নিম্নবর্ণিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো সংযুক্ত করা প্রয়োজনঃ ১. দারিদ্র বিমোচনের জাতীয় কর্মকৌশলের সাথে সংযোগ সম্পন্ন পুনর্বণ্টনমূলক সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন। এই সংস্কারের সাথে (ক) ব্যাপক কৃষি সংস্কার কর্মসূচির অধীনে ভূমি মালিকানা পুনর্বণ্টন, (খ) সরকারি খাতে ব্যয় তালিকায় অগ্রাধিকার সূচকের পরিবর্তন, (গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং (ঘ) নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ন্যায়পরায়ণ বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে লিঙ্গ বৈষম্যজনিত সব বাধা অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা সংযুক্ত করতে হবে। ২. দুর্নীতিজনিত সমস্যা মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণঃ এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী হিসাব নিরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দেশের আইন পরিষদের কাছে জবাবদিহি করবে। তারা ব্রাইবারি (উৎকোচ) কনভেনশন এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত তদীয় নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। ৩. উন্নয়নশীল দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানোন্নয়ন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় পরিচালিত কর্মতৎপরতার ওপর সব সরকারকে নিজ নিজ আইন পরিষদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনার সময় বিভিন্ন দেশের সরকার এবং সুশীল সমাজের মধ্যকার সংলাপের মান বিচারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। ৪. বিশ্বব্যাপী ট্রাস্ট বিরোধি কর্মধারার বিশ্ব অর্থনীতিতে যৌথ বাণিজ্য সংস্থার ব্যাপক উপস্থিতি ও সংহত প্রভাব প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে মনোপলি বিরোধি আইনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জাতীয় সীমানার বাইরে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ৫. বাণিজ্য সম্পর্কিত ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র দেশের জন্য কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার

বিশ্ব পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক সংহতি যেমন অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে তেমনি তা অসাম্য বৃদ্ধি এবং দারিদ্র প্রসারের কারণও হতে পারে। আবার ন্যায়নীতি ও সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রের অভিশাপমুক্ত করতে পারে। কিন্তু বিরাজমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা বাজারমৌলবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং শক্তিমান TNCসমূহ ও বিত্তশালী জাতিগোষ্ঠির কায়েমী স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হচ্ছে বলে বিশ্বের সকল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি প্রান্তিক অবস্থানে উপনীত হবে এবং সারা পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দরিদ্র হবে। এই হতাশা থেকে পরিত্রাণের উপায় কেবল একটি, আর তা হলো, বিপন্ন জনগণের মিলিত সংগ্রাম। একমাত্র গণসংগ্রামের মাধ্যমেই স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত গতিতে মানবোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটানো সম্ভব।